দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... JUN. 29 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৪

বই যখন বিতর্কের বিষয়

সোহরাব হাসান

বইকে এতদিন ফ্যালনা একটি বিষয় হিসেবে ভারা হতো। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধের সেই বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহিণীর ঝাঁঝালো উক্তির মতো, 'ঘরে একটি বই আছে অতএব আর একটি কেনার প্রয়োজন নেই।' ক্রিকেট থেকে শুরু করে বাজেটে সিরামিকের উপর কতটা শুল্ক বসানো হলো ইত্যাদি নিয়ে সংসদে দীর্ঘ আলোচনা হয়, উত্তপ্ত বিতর্ক হয়; কিন্তু বইয়ের বিষয়টি সবসময় উপেক্ষিতই থেকে যায়। সেই বই যদি পত্রপত্রিকা ও বাংলাবাজারে সরগরম আলোচনার বিষয় হয় সেটি ভারি আনন্দের কথা। বইয়ের ব্যাপারটি প্রথম আলোচনায় আসে গেল জানুয়ারি মাসে কলকাতা বইমেলার সময়। সেই আলোচনা ও বিতর্কের নিট ফল হলো পশ্চিম বঙ্গে বাংলাদেশের বইয়ের চাহিদা বেশ খানিকটা বেড়েছে। আগে পশ্চিম থেকেই বই আসতো, এখন পূর্ব থেকেও যাচ্ছে।

হালে বই আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে দুটি কারণে। প্রথমত, প্রস্তাবিত ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের বাজেটে বিদেশী বইয়ের উপর আমদানি শুল্ক সাড়ে ৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। স্বভাবতই এতে আমদানিকৃত বিদেশী বইয়ের দাম বেড়ে যাবে। প্রকাশক ও পুস্তক আমদানিকারকরা একে সরকারের একটি জ্ঞানবিদ্বেষী ও শিক্ষাবিরোধী পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। দেশের খ্যাতিমান লেখক-শিল্পীরাও বই আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস বা সম্ভব হলে পুরোটা বাতিল করার কথা বলেছেন।

দেশীয় প্রকাশনার স্বার্থে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে সরকার একটা খোঁড়া যুক্তি দেখাতে পারেন; কিন্তু বই তো আর পাঁচটি পণ্যের মতো নয়। একটি দেশীয় বই কখনো একটি বিদেশী বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীসহ সকল শ্রেণীর পাঠক দেশী-বিদেশী সকল বইই পড়বেন। জ্ঞানের রাজ্যে এই অযাচিত হস্তক্ষেপ কারো কাম্য নয়। দ্বিতীয় কথা হলো, যে প্রকাশকদের মুখের দিকে তাকিয়ে সরকার বইয়ের উপর আমদানি শুল্ক বাড়ালেন সেই প্রকাশকরাই বলছেন, এটি দেশীয় প্রকাশনা শিল্পের সহায়ক হবে না। বরং শুল্ক বাড়ানোর ফলে পাইরেসি বা নকল নবিশি বেড়ে যাবে। সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী ধর্মীয় ও পাঠ্যবই বর্ধিত শুল্কহারের বাইরে থাকবে। প্রশ্ন হলো, অন্যান্য বই যদি শুল্ক দিয়ে আমদানি করাকে সরকার যুক্তিসঙ্গত মনে করেন তাহলে ধর্মীয় বইয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন? আওয়ামী লীগ সরকার কি দেশবাসীকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চায়? জ্ঞানের আর সব শাখা বন্ধ হয়ে যাবে সেটাই কি সরকারের কাম্য? সরকারিভাবে বলা হয়েছে, পাঠ্যবইয়ের ওপর শুল্কারোপ হয়নি। এক্ষেত্রে পাঠ্য ও অপাঠ্যের সীমা নির্ধারণও কঠিন নয় কি? শেকসপীয়রের অথেলো যদি বিনা শুল্কে আনা যায় তাহলে হ্যামলেট বা মার্চেন্ট অফ ভ্যানিস কেন যাবে না? তিনটি কালজয়ী সাহিত্য এবং ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের অবশ্যপাঠ্য। কারিকুলামে যে বইয়ের উল্লেখ আছে তার বাইরে কি শিক্ষার্থীরা কোন বই পড়বে না?

বাদ-প্রতিবাদ ও সমালোচনার মুখে সরকার ইতোমধ্যে চিকিৎসক ও আইনজীবীদের উপর ভ্যাট আদায়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি প্রশ্ন রাখতে চাই বইয়ের উপর বর্ধিত শুল্ক তারা প্রত্যাহার করেছেন না কেন? দুটি কারণে এটি হতে পারে। প্রথমত, বইয়ের প্রকাশক-পাঠকরা আইনজীবী ও চিকিৎসকদের মতো সংগঠিত নন। ফলে তাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়টি সাংসদদের সমর্থন পাচ্ছে না। অথবা সাংসদরা অনেক আগেই বই পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে বইয়ের মতো একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করার সময় তাদের নেই। লেখক-গবেষক-প্রকাশকরা বইয়ের ওপর আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। আমাদের স্পষ্ট দাবি হলো, বইয়ের উপর প্রস্তাবিত শুল্কহার প্রত্যাহার করা হোক।

বই নিয়ে দ্বিতীয় বিতর্কের ঘটনাটি হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক তিন কোটি টাকার বই কেনার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে। আগেই পাঠকদের জানিয়ে রাখি স্কুল-কলেজে লাইব্রেরি অথবা বই কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ এবারই প্রথম হয়নি। অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে। অতীতে বিভিন্ন কলেজে বইয়ের জন্য যে অর্থ দেয়া হতো তার শতকরা ৯০ ভাগই বই কেনার কাজে ব্যবহৃত হতো না। যেসব স্কুল বা কলেজে শিক্ষকের বেতন বাকি পড়ে থাকে সেসব কলেজ বই কেনার বিলাসিতা দেখাতে পারে না। বইয়ের চেয়ে শিক্ষক বেতন বা কলেজ ভবন মেরামতের কাজই অগ্রাধিকার পায়। যেসব কলেজ অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যতিক্রম বাদে তারাও বই কেনার ব্যাপারে নির্লজ্জভাবে উদাসীন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে ঢাকা শহরের কলেজগুলোর ওপর একটি জরিপ করে দেখতে পারেন। বেশিরভাগ কলেজে লাইব্রেরি নেই, লাইব্রেরি থাকলেও পাঠ্য বা রেফারেন্স বইয়ের বাইরে সৃজনশীল কোন বই পাওয়া যাবে না। এই চিত্র শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। জাতীয় প্রেসক্লাবের মতো প্রতিষ্ঠানে বিগত এক বছরে একটি বইও কেনা হয়নি বলে সাধারণ সম্পাদকের লিখিত রিপোর্টে জানানো হয়েছিল।

এই অবস্থায় প্রকাশকদের দাবি অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় কলেজসমূহে বইয়ের টাকা না দিয়ে সরাসরি বই সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেন। আগে এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছরেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো বই কিনে কলেজসমূহে পাঠানোর ব্যবস্থা নেন। এর মধ্যে সরকারি কলেজ ২শ' ও বেসরকারি কলেজ তিনশ'। প্রতিটি কলেজে প্রায় ৫শ' টাইটেলের বই সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত হয়। সরকারের এ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের অভিযোগ (১) বই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গুণাগুণ বিচার করা হয়নি, (২) কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগ বই তালিকাভুক্ত করেছে, (৩) প্রকৃত লেখকদের বাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংসদ, আমলা ও সাংবাদিকদের বইকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের জবাব হচ্ছে (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এককভাবে বই বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়নি। এ ব্যাপারে একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং সেই কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্তক্রমে বই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; (২) গুটিকয়েক নয় খ্যাত/অখ্যাত ১৫১টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; (৩) সর্বমোট প্রায় ৫শ' টাইটেলের বই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, আমলাদের বইয়ের সংখ্যা হবে ৫০টিরও কম। দুপক্ষের বক্তব্য বিচার, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য খারাপ নয়। এর মাধ্যমে প্রকাশকদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করা হয়েছে। প্রকাশ করা বলে আসছিলেন, বাংলাদেশে সৃজনশীল বইয়ের প্রসার ঘটাতে হলে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই সরকার এ সহযোগিতা দিয়ে থাকে। প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিম বঙ্গেও সৃজনশীল বইয়ের একটা বড় অংশ সরকার কিনে নিয়ে স্কুল-কলেজ ও গ্রন্থাগারসমূহে বিতরণ করে থাকে। সেক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বই কেনার উদ্যোগটি ভিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বই না কিনলেও বরাদ্দকৃত অর্থ পড়ে থাকতো না। বিভিন্ন কলেজে চলে যেত এবং তা যথারীতি অন্য কাজে ব্যয় হতো। এই বিবেচনায় নানা ভুলত্রুটি সত্ত্বেও বই কেনার উদ্যোগকে স্বাগত জানানো উচিত। কেননা ৫শ' টাইটেলের বইয়ের সঙ্গে শুধু প্রকাশকরাই জড়িত নন। এর সঙ্গে জড়িত আছেন লেখক, গবেষক, মুদ্রক, বাঁধাইকারক, কাগজ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পুরো বই জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান করেছেন তেমনি বই বিক্রির পরিমাণও বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি টাকা দিয়ে ৪ কোটি ১৪ লাখ টাকার বই কেনা সম্ভব হয়েছে এবং প্রকাশকরা নিজ উদ্যোগে বই কলেজসমূহে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। বই নিয়ে এই বিরাট কর্মযজ্ঞ অতীতে কখনো দেখা যায়নি। এর মাধ্যমে শুধু প্রকাশক বা লেখকরাই উপকৃত হবেন না, লাভবান হবে দেশের প্রকাশনা জগৎ এবং জ্ঞানবান হবে শিক্ষার্থীকুল।

বইয়ের তালিকা নিয়ে যেসব অভিযোগ এসেছে তা সংশোধনও অসম্ভব নয়। বর্তমানে সম্পূর্ণ আমলানির্ভর কমিটির স্থলে একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদের নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হলে তার বাছাই অনেকাংশে পক্ষপাতহীন হবে বলে আমাদের ধারণা। এর পাশাপাশি যে সরকারি কর্মকর্তারা এই কমিটিতে থাকবেন তাদের অবশ্যই গ্রন্থজগৎ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকতে হবে। কমিটিতে গ্রন্থজগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের সংখ্যা ভারি হলে অন্যের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সঙ্গে কমিটিকে অবশ্যই স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে এবং লেখকের পদ-পদবির স্থলে বইয়ের গুণাগুণই একমাত্র বিবেচ্য। বর্তমান কমিটি প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও আমলাদের যে বই বাছাই করেছেন তার মধ্যে সব বইই যে নিম্নমানের তা বলা যাবে না। মন্ত্রী-আমলা হলে তিনি লেখক হতে পারবেন না এমন কোন কথা নেই। দেখতে হবে বইটি শিক্ষার্থীদের জন্য কতটা জরুরি এবং একই বিষয়ে এর চেয়ে ভাল বই বাজারে আছে কিনা? তবে এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও বলা প্রয়োজন, মন্ত্রী-আমলাদের বই এমনিতেই বিভিন্ন চ্যানেলে বিক্রি হয়ে যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোটায় তারা যত কম আসবেন অন্য লেখকরা তত বেশি সুযোগ পাবেন। যেকোন কাজে প্রথমবার ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

সঙ্গত কাজ হবে পরবর্তীতে সেই ভুল-ত্রুটিগুলো এড়িয়ে যে উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি নেয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সফল করা। ভুলত্রুটির অজুহাত তুলে শিক্ষার্থীদের কাছে বই তুলে দেয়ার মতো একটি প্রকল্প শুরুতেই ভন্ডুল করে দেয়ার কোন যুক্তি নেই। মাথা ব্যথার ওষুধ মাথা কেটে ফেলা নয়। বই সরবরাহে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রয়কৃত বইয়ের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু যারা সূচনাতেই এই প্রকল্পের মৃত্যুঘন্টা বাজাতে চান তাদের উদ্দেশ্য যে সৎ নয় তা পর্যন্ত বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না।